E-CONTENT PREPARED BY

Dr. Shreya Ray

Assistant Professor

Department of Bengali

Durgapur Government College, Durgapur, West Bengal

(*Affiliated to Kazi Nazrul University, Asansol, West Bengal*)

NAAC Accredited "A" Grade College

(Recognized under Section 2(f) and 12(B) of UGC Act 1956)

E-Content prepared for students of

B.A. Honours (Semester- VI) in Bengali

Name of Course: বাংলা ছোটোগল্প

Topic of the E-Content: আদাব

আদাব

উদ্দেশ্য:- সম্প্রীতির বার্তা নিয়ে সমরেশ বসুর ‘আদাব’ গল্পের হাত ধরে পাঠকের সামনে এসেছিলেন। ভগবান-আল্লাহ নিয়ে যে দ্বন্দ্ব-সংঘাতের ভূমিতে তিনি সম্প্রীতি ভ্রাতৃত্ববোধের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন বর্তমানে একবিংশ শতাব্দীতেও তার সমধিক প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

“মোরা এক বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু-মোসলমান। মুসলিম তার নয়ণ-মণি, হিন্দু তাহার প্রাণ”

— কাজী নজরুল ইসলামের এই বাণী যেন সমরেশ বসু গদ্যের ভাষায় চিত্রায়িত করেছেন। সেই বাণী উপলব্ধির গুরুত্ব বর্তমান সময়েও প্রাসঙ্গিক। এই দৃষ্টিকোণ থেকে ‘আদাব’ গল্পটি পুনঃপাঠের দাবী রাখে।

গল্পের নাম: - ‘আদাব’

লেখক নাম: - সমরেশ বসু

লেখক পরিচিতি:- জীবনকাল ১৯২৪-৮৮ খ্রিস্টাব্দ। জন্মসূত্রে প্রাপ্ত নাম সুরথনাথ বসু। তবে সমরেশ বসু নামে সাহিত্যজগতে পরিচিতি ও খ্যাতি লাভ করেন। এছাড়াও কালকূট ও ভ্রমর ছদ্মনামে সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। ‘পরিচয়’ পত্রিকায় ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে শারদীয়া সংখ্যা প্রকাশিত ‘আদাব’ গল্পের মধ্য দিয়ে বাংলা সাহিত্য জগতে তাঁর আগমন ঘটে। তার প্রথম উপন্যাস ‘নয়নপুরের মাটি’। তবে পুস্তাকাকারে প্রকাশিত প্রথম উপন্যাস ‘উত্তরঙ্গ’ (১৯৫১)। কালকূট ছদ্মনামে রচিত ‘শাম্ব’ উপন্যাসের জন্য ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার পেয়েছেন। তাঁর সাহিত্য ভান্ডারের মধ্যে

রাজনৈতিক ঘটনাবলী, শ্রমজীবী মানুষের জীবন ও যৌনতাসহ বিভিন্ন বিষয়ে উজ্জ্বলভাবে চিত্রিত হয়েছে। তার উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গল্প হল 'আদাব', 'কিমলিস', 'স্বীকারোক্তি', 'অকাল বসন্ত', 'মানুষ রতন' ইত্যাদি এবং উপন্যাস হল 'নয়নপুরের মাটি','বিবর', 'প্রজাপতি', 'দেখি নাই ফিরে' ইত্যাদি।

গল্পগ্রন্থ: - 'মরশুমের একদিন'(১৯৫৩) গল্পগ্রন্থের বারোটি গল্পের মধ্যে একটি গল্প হল 'আদাব'।

গল্পের প্রেক্ষাপট: - দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়ে যখন সারা বিশ্বের রাজনৈতিক, সামাজিক তথা মানসিক পরিবেশ এমনিতেই নড়বড়ে, সেই সময় ভারতে ঔপনিবেশিক শক্তির কুচক্রে ধর্মের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা দ্বিজাতিতত্ত্বের অবশ্যম্ভাবী ফল হিসেবে দেশভাগ শুধু দেশ নয়, মানুষের মানবিকতাবোধ মনুষ্যত্ববোধকেও দ্বিখণ্ডিত অথবা বহুখণ্ডিত করেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে ১৯৪৬-এর ১৬ আগস্ট তৎকালীন মুসলিম লীগ 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস'- এর ডাক দিলে শুরু হয় হিন্দু-মুসলমানের

রক্তক্ষয়ী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ তখন বিশ্বাসহীনতা,ঘৃণা, আক্রোশ, সংশয়, সন্দেহ ইত্যাদিতে উত্তপ্ত। জীবনানন্দের ভাষায় '১৯৪৬-৪৭'কবিতানুযায়ী —

যদি ডাকি রক্তের নদীর থেকে কল্লোলিত হ'য়ে/ ব'লে যাবে কাছে এসে, 'ইয়াসিন আমি,/ হানিফ মহম্মদ মকবুল করিম আজিজ—,/ আর তুমি?' আমার বুকের 'পরে হাত রেখে মৃত মুখ থেকে,/ চোখ তুলে সুধাবে সে— রক্তনদী উদ্বেলিত হ'য়ে,/ বলে যাবে, 'গগন, বিপিন, শশী,"— এই পটভূমিতে সমরেশ বসু লিখেছেন 'আদাব' গল্পটি।

গল্পের মর্মার্থ : মানবতার জয়গান:-

অভিজ্ঞতানির্ভর কথাকার সমরেশ বসু মনে করতেন,- "সাহিত্যের থেকে জীবন বড়ো, এ সত্যের জন্য সাহিত্যিককে গভীর অনুশীলন করতে হয় না। তা সততই অতি জীবন্ত' ('নিজেকে জানার জন্য, গল্প সংগ্রহ -১, সমরেশ বসু)—১৯৪৬-এর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার অভিজ্ঞতা ও সমরেশ বসু ঢাকার যে অঞ্চলে থাকতেন সেই অঞ্চলের অসাম্প্রদায়িক তথা ভ্রাতৃত্বপূর্ণ পরিবেশের ফলশ্রুতি হিসেবে জন্ম নেয় 'আদাব' গল্প এবং সৃষ্টি হয় হিন্দু শ্রমিক ও মুসলমান মাঝির মতো চরিত্র। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ 'লালসালু' উপন্যাসে সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের চরিত্র বর্ণনায় লিখেছেন,– মানুষ " **চেনে জমি আর ধান। চেনে পেট। খোদার কথা নেই। স্মরণ করিয়ে দিলে আছে নচেৎ ভুলে মেরে থাকে।"** — এই ছবি শুধু মহব্বতনগরের ছবি নয়, তথাকথিত সাধারণ মানুষের জীবনযাপনের ছবি। তারা কখনই ইচ্ছাকৃতভাবে ধর্মের নামে মারামারি করতে নামে না। তাদের প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য হল নিজেদের পেট ভরানো ও তাদের কাছে নিজের

তথা পরিবারের নিরাপত্তা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার রক্তাক্ত পথে বসে 'আদাব' গল্পের দু-জন সাধারন মানুষ অবলীলাক্রমে বলে জীবনের আসল সত্য। সুতামজুর দাঙ্গার কারণ হিসেবে যখন বলেছে, **"দোষ ত' তোমাগো ওই লীগওয়ালাগোই। তারাই ত' লাগাইছে হেই কিয়ের সংগ্রামের নাম কইরা।"** তখনই মাঝির মুখে উচ্চারিত হয় সেই জীবন-জিজ্ঞাসা "আমি জিগাই মারামারি কইরা হইব কী। তোমাগো দু'গা লোক মরব, আমাগো দু'গা মরব। তাতে দ্যাশের কি উপকারটা হইব?"

আদাব গল্পে দাঙ্গা, মারামারি ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি ইত্যাদি সমস্ত কিছুকে অতিক্রম করে ফুটে ওঠে বৃহত্তর মানব ধর্মের রূপ। স্বামী বিবেকানন্দ শিকাগো ধর্ম সম্মেলনে যে সনাতনধর্ম তথা মানবধর্মের কথা বলেছিলেন তাই যেন 'আদাব' গল্পের ভিন্ন রূপে ভিন্ন ভাষায় উপস্থাপিত হয়েছে। এই গল্পে দু-টি মানুষের সাক্ষাৎকার ঘটে দু-টি গলির সংযোগস্থলে। সেই সময় নাটকীয় ভাবে শোনা যায় দু-টি শব্দ বন্দেমাতরম ও আল্লাহ-আকবর। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন একাধিক ভিন্ন পথগামী নদী শেষপর্যন্ত সাগরে গিয়ে মিলিত হয়, তেমনিভাবে সমরেশ বসু দু-টি ভিন্ন পথের সংযোগস্থলে দুটি মানুষের মিলনের ইঙ্গিত দিলেন। সনাতন ধর্ম বলতে আত্মার ধর্মকে বঝানো হয়। আর আত্মাদের মধ্যে কোনো ভেদ নেই। যেহেতু মানুষ সর্বশ্রেষ্ঠ জীব,মানুষের মধ্যে দিয়ে শুভবুদ্ধির প্রকাশ যথার্থভাবে সম্ভব তাই তাকে মানবধর্মরূপেই ভালোভাবে অনুভব করতে পারা যায়। অর্থাৎ বাইরের পোশাক হিন্দু, মুসলিম, শিখ, জৈন যাই হোক না কেন তাদের এক ধর্ম। লেখক এর ভাষায়, 'আছে এক ধর্ম, মনুষ্যধর্ম।' এই ধর্ম মানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসা, শ্রদ্ধা সম্মান, সহমর্মিতার সমন্বিত রূপ।

গল্পে দেখা যায় ডাস্টবিনের দুইপাশে উপবেশন কারী দু-জন মানুষ একে অপরকে বিশ্বাস করতে পারে না, **'উভয় উভয়কে ভাবছে খুনি'** তারা কেউ কাউকে

নিজেদের ধর্মের পরিচয় দেয়নি। বরং নায়ের মাঝি বলেছে, তার বাড়ি **‘বুড়িগঙ্গার হেইপাড়ে — সুবইডায়’** এবং আরেকজন বলে বলে সে **‘নারাইনগঞ্জের সুতাকলে’** কাজ করে। এখানে দু-টি চরিত্রের নাম নেই। হয়তো গল্পকার নামের মধ্য দিয়ে দু-টি মানুষের ভেদাভেদ রাখতে চাননি। কারণ প্রচলিত রীতি অনুযায়ী নাম জাতি ধর্মের প্রতিনিধিত্ব করে। আবার যেহেতু নৌকার মাঝি ও সুতাকলের শ্রমিক একক সত্তা নয়, তারা দু-টি ধর্মের প্রতিনিধি এবং তারা নিজেদের যুদ্ধবিরোধী মতামত তীব্র ভাষায় ব্যক্ত করেছে তাই তাদের নামকরণের প্রয়োজন হয় না। তাদের একটাই পরিচয় তারা মানুষ এবং তাদের ধর্ম মানবধর্ম।

তৎকালীন সময় পরিস্থিতি-পরিবেশ-মানুষের অস্থি-মজ্জা-শোনিতে মিশিয়ে দিয়েছিল সন্দেহের বিষ। তাই যখন মাঝি তাদের সহাবস্থানের স্থান ত্যাগ করতে চায় তখন সুতামজুর তাকে বাধা দিলে দুজনের এই আচরণে দুজন দুজনকে সন্দেহ করে। জীবনানন্দের ভাষায়, “সকলেই আড়চোখে সকলকে দেখে।... আমাদেরি আন্তরিকতাতে আমাদেরি সন্দেহের ছায়াপাত টেনে এনে ব্যথা খুঁজে আনা।” তাই যখনই আন্তরিকতার সঙ্গে মাঝি সুতা মজুরের হাত থেকে দেশ নিয়ে জ্বালাতে গিয়ে ‘সোহান্ আল্লা’ বলে ফেললে তখনই পুনরায় অবিশ্বাস সন্দেহের বাতাবরণ তৈরি হয়। কিন্তু কিছু সময়ের মধ্যে তাদের সব নেতিবাচক ভাবনার অবসান ঘটে। কারণ তারা ভয় পেলেও তাদের মনে মানবধর্ম জাগ্রত ছিল। তারা কথা বলে ‘আত্মীয়-বন্ধু’- মতো। সুতামজুর জানতে পারে মাঝি ছেলে-মেয়ের জন্য নতুন পোশাক বিবির জন্য নতুন শাড়ি ঈদ উপলক্ষে কিনে বাড়ি যাচ্ছে। কথোপকথনের মধ্যেই তাদের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এই সূত্রে মাঝি জানায় হিন্দু জমিদার রূপবাবুর নায়েব তাকে নৌকা পারাপারের সময় পাঁচ টাকা দিত। তার মতে **‘বাবুর হাত য্যান হজরতের হাত’** অর্থাৎ মাঝির কথার পুনরায় প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে হিন্দু-মুসলিমের একত্রিত রূপ, তাদের হৃদয়ের

সম্পর্কে অদৃশ্য বন্ধন। একজন ভাই আরেকজনের হাত ধরে পথ দেখায়। মাঝি সুতামজুরকে পুলিশের চোখ এড়িয়ে হিন্দুআস্তানায় রেখে নিজে যেতে চায় ইসলামপুর ফাঁড়ির কাছে। কিন্তু **'উৎকণ্ঠায় সুতা-মজুর কামিজ চেপে ধরে।'** সময়ের সহযোগে,কণ্ঠস্বরের আন্তরিকতায় প্রকাশিত হয় তাদের একে অপরের প্রতি ভালোবাসা। তারা হিন্দু-মুসলিম পরিচয় ত্যাগ করে একে-অপরকে বলে 'আদাব'। এই শব্দটি সম্প্রীতির এক উজ্জ্বল অভিজ্ঞান বহন করে। মাঝি করে যাত্রাপথের উদ্দেশ্যে রওনা হলে সুতামজুর ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে। একজন মানুষ আরেকজন পিতা, স্বামী তথা মানুষের স্বপ্ন নিজের মনে করে নেয়।

'মেঘে ঢাকা তারা'-র নীরার মতো মাঝিও ভেবেছে **'আমি বাঁচতে চেয়েছিলুম'** কিন্তু ফাঁড়ির পুলিশ শুধুমাত্র ডাকাত সন্দেহে মাঝিকে গুলি করে হত্যা করে রাষ্ট্রশক্তি ও তার পুলিশবাহিনী মানুষকে মানুষ মনে করত না। তাই তাদের সন্দেহের ফলে একজন নিরপরাধ মানুষের **"বুকের রক্তে তার পোলা-মাইয়ার, তার বিবির জামা,শাড়ি রাঙা হয়ে উঠেছে।"** কিংকর্তব্যবিমূঢ় সুতা মজুরের চোখে শুধু এই দৃশ্য ভেসে উঠেছে। কিন্তু সে এতটা অসহায় যে অন্যায়ের প্রতিবাদ তো দূরের কথা মাঝির কাছে ছুটে আসতে পারেনি। সুতা মজুর পূর্বে মাঝিকে বলেছিল **"ন্যাতারা হেই সাততলার উপুড় পায়ের উপুড় পা দিয়া হুকুম জারি কইরা বইয়া রইল আর হালার মরতে মরলাম আমরাই।"** সেই কথাই বাস্তবের রূপ পেল মাঝির মৃত্যুর মধ্য দিয়ে। লেখক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ভয়াবহ রূপ দেখালেন ঠিকই কিন্তু মাঝি ও সুতা মজুরের সম্পর্কের বৃহত্তর রূপ, মহানুভবতার কাছে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ছোটো হয়ে যায়। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'অর্জুন' উপন্যাসে অর্জুন বলেছে- **"এই দুর্ব্যার ওরা আমাকে মেরে ফেলার চেষ্টা করছিল। কিছুতেই পারবে না। কোনও দিন পারবে না। আমি বেঁচে থাকব।"** সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় মাঝির মৃত্যু

ঘটলেও বেঁচে থাকে মানুষ, মানবধর্ম, মানুষের সঙ্গে মানুষের হৃদয় সম্পর্ক। মানবতার জয়ধ্বনি ধ্বনিত হয় 'আদাব' গল্পের মূল সুর হিসেবে।

ছোটগল্প হিসেবে স্বার্থকতা-

ছোটোগল্প উপন্যাস নয়, নভেলেট নয়, ছোটোগল্পকে এককথায় বলা যায় বিন্দুতে সিন্ধু দেখা। যে সাহিত্য প্রকরণে হঠাৎ উদ্ভাসিত জীবনের এক ক্ষুদ্র অংশের কাহিনি জাগরিত হয়ে একমুখিভাবে দ্রুত গতিতে এগিয়ে যেতে থাকে এবং চরম মুহূর্তে পাঠকের মনে টানটান উত্তেজনার সৃষ্টি করে আবার হঠাৎ প্রদীপের শিখার মতো দপ করে শেষ হয়ে যায়। কিন্তু তার শেষ আলোর চমক পাঠকের মনে আলো হয়ে জ্বলতে থাকে, বাংলা ছোটোগল্পের স্রষ্টা ও শ্রেষ্ঠ শিল্পী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায় **—"অন্তরে অতৃপ্তি রবে সাঙ্গ করি মনে হবে / শেষ হয়ে হইল না শেষ।।"** স্বল্পসংখ্যক চরিত্র ও সহজ সরল ভাষায় সৃষ্ট এই শিল্পরূপকে ছোটোগল্প বলে।

ছোটোগল্পের বৈশিষ্ট্য –

১.সাধারণত ছোটোগল্পের আকার ছোটো হয় এবং ছোটো ছোটো বাক্যের মধ্যে গভীর ব্যঞ্জনা প্রকাশিত হয়।

২.স্বল্পপরিসরে সংযত লেখনী শক্তির মাধ্যমে লেখক পাঠকের মনে একক ধারণা বা single impression সৃষ্টি করে।

৩.একমুখীভাবে অগ্রসিত হতে হতে গল্পের একটা শিখর বিন্দু তৈরি হয়,যাকে চরম মুহুর্ত বা Climax বলে।

৪.ছোটোগল্পের প্লট হয় একটি, একমুখী ও সুনিয়ন্ত্রিত গ্রন্থনের উপর অবস্থিত এবং চরিত্রের সংখ্যা হয় কম।

'আদাব' গল্পে দেখা যায় মাত্র দুটি চরিত্রের সাক্ষাৎ ও কথপোকথনের মধ্যে দিয়ে কাহিনি দ্রুত গতিতে এগিয়ে গিয়েছে। সহজ সরল ছোটো ছোটো বাক্যে জীবনের ব্যঞ্জনা ফুটে ওঠে। কলকাতার দাঙ্গার একটিমাত্র পটভূমিতে পুলিশের গুলির '—হলট্...' আওয়াজে চরম মুহূর্তের সৃষ্টি হয়ে পাঠকের মনে এক ঘোর সৃষ্টি করে গল্প শেষ হয়ে যায়। ছোটো আকারের গল্পে ছোটো ছোটো যতি চিহ্নের ব্যবহার ও চরিত্রের মুখে আঞ্চলিক ভাষার প্রয়োগ কাহিনিকে সজীবতা দান করেছে।

সহায়ক গ্রন্থ:-

১.একালের ছোটগল্প-সম্পাদনা ডঃ সরোজমহোন মিত্র

২.গল্পচর্চা- সম্পাদনা উজ্জ্বল কুমার মজুমদার

সম্ভাব্য প্রশ্ন:-

প্রশ্নের মান -১০

১.সমরেশ বসু আদাব গল্প মানবতার জয়গান কীভাবে গেয়েছেন আলোচনা করো।

২.মাঝি ও সুতামজুর অসহায় দুই প্রতিবাদী সত্তা- 'আদাব' গল্প অবলম্বনে এই উক্তির যথার্থতা বিচার করো।

৩.'আদাব' গল্পের নামকরণের সার্থকতা সম্বন্ধে তোমার মতামত দাও।

অথবা,

'আদাব'— মানবধর্ম প্রসূত শব্দ আলোচনা করো।

প্রশ্নের মান -৫

১“মানুষ না,আমরা য্যান কুত্তার বাচ্চা হইয়া গেছি”—আলোচনা করো।

২.“মুহূর্তগুলিও কাটে যেন মৃত্যুর প্রতীক্ষার মতো।”— আলোচনা করো।